বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা
অষ্টবিংশতিতম খন্ড বার্ষিক সংখ্যা ১৪১৭

অপুষ্টি নিরসনে জিংক সমৃদ্ধ ধানের জাত: একটি অভিনব আন্তর্জাতিক প্রকল্প

মাহবুব হোসেন*
রেজাউল করিম

জিংক (দস্তা) মানবদেহের জন্য একটি অতি প্রয়োজনীয় খাদ্য উপাদান। নারী, পুরুষ, শিশু, বৃদ্ধ সবার জন্যই জিংক প্রয়োজন। একজন সুস্থ এবং প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের জন্য প্রতিদিন প্রায় ৪ মিলিগ্রাম, একজন প্রাপ্তবয়স্ক মহিলার জন্য প্রায় ৩ মিলিগ্রাম, একজন শিশুর জন্য প্রায় ১-৩ মিলিগ্রাম ও একজন বাড়ন্ত শিশুর জন্য প্রায় ৩-৫ মিলিগ্রাম জিংক প্রয়োজন। গর্ভবতী ও প্রসূতি মহিলাদের জন্য জিংকের প্রয়োজন কিছু বেশি। একজন গর্ভবতী মহিলার জন্য দৈনিক প্রায় ৩-৬ মিলিগ্রাম এবং প্রসূতি মহিলার জন্য দৈনিক প্রায় ৬ মিলিগ্রাম জিংক প্রয়োজন হয়। স্বাভাবিক খাদ্যে প্রাণিজ আমিষের পরিমাণ কম থাকলে জিংক গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা এই পরিমাণ থেকে প্রায় তিনগুণ বেড়ে যায়। আমাদের দেহে যথেষ্ট পরিমাণ গ্রহণযোগ্য জিংক জমা রাখা যায় না বলে সবারই প্রায় প্রতিদিনই কিছু না কিছু জিংক সমৃদ্ধ খাবার খেতে হয়।

পরিমাণে অনেক কম খেতে হয় বলে জিংককে অনুপুষ্টি (Micronutrient) বলা হয়। এরই অভাবজনিত অপুষ্টিতে মানবদেহে মারাত্মক ক্ষতিসাধিত হতে পারে। ছোট বাচ্চা এবং শিশুদের শরীরে জিংক-এর অভাব হলে তাদের শারীরিক বৃদ্ধি হ্রাস পায়। ফলে তারা চিরদিনের জন্য বয়সের তুলনায় খাটো (Stunted) হয়ে যেতে পারে। জিংক একটি রোগ প্রতিরোধক অনুপুষ্টি। এর অভাবে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়, রোগবালাইয়ের আক্রমণ বেড়ে যায় এবং তা থেকে মৃত্যুও ঘটতে পারে। গর্ভবতী ও প্রসূতি মহিলাদের জন্য জিংকের অভাব খুবই মারাত্মক। এক্ষেত্রে প্রসব সমস্যা বেড়ে যাওয়ার ঝুঁকি থাকে এবং তা থেকে মা এবং নবজাতকের মৃত্যুও ঘটতে পারে। অনেকক্ষেত্রে নবজাতকের ওজন কম হতে পারে এবং পরবর্তী সময়ে তাদের বিভিন্ন পরিচর্যা, যেমন, পুষ্টি সুরক্ষা, রোগবালাই দমন, শারীরিক বৃদ্ধি ইত্যাদি অনেক কঠিন ও ব্যয়সাধ্য হয়ে পড়ে।

খাদ্যে জিংকের অভাব এবং অপুষ্টি ও স্বাস্থ্যহীনতার উপর তার প্রভাব সংক্রান্ত গবেষণা অতি সাম্প্রতিক ঘটনা। পৃথিবীর অধিকাংশ দেশের মতো বাংলাদেশেও জিংক স্বল্পতার হার কত তার সুনির্দিষ্ট হিসাব এখনও পাওয়া যায়নি। তবে পারিবারিক খাদ্য গ্রহণ, শিশু অপুষ্টি হার, জন্ম ওজন ইত্যাদি বিবেচনা করে বাংলাদেশের প্রায় অর্ধেক পরিবার এবং অর্ধেক শিশু জিংক স্বল্পতায় ভুগছে বলে বিজ্ঞানীদের ধারণা। সংখ্যাটি বিপুল। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার সংজ্ঞা অনুযায়ী কোনো দেশের শতকরা ২০ ভাগ শিশু বয়সের তুলনায় খাটো হলেই সে দেশে সার্বিকভাবে জিংক স্বল্পতা বিরাজ করছে বলে ধরে নেওয়া হয়। এই সংজ্ঞা অনুযায়ী বিশ্বের তীব্র জিংক সংকট অঞ্চলগুলোর মধ্যে বাংলাদেশও রয়েছে।

* লেখকদ্বয় যথাক্রমে নির্বাহী পরিচালক, ব্র্যাক ও উপদেষ্টা, গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগ, ব্র্যাক।

জিংক স্বল্পতার এই অভিশাপ থেকে মুক্তি পাওয়ার প্রধান উপায় হল জিংক সমৃদ্ধ খাবার খাওয়া। মাছ, মাংস ইত্যাদি প্রাণিজ খাদ্যে যথেষ্ট পরিমাণে জিংক রয়েছে। এ ছাড়া কিছু কিছু ডাল ও বাদাম জাতীয় খাদ্যেও রয়েছে জিংক। কিন্তু উদ্ভিদ জাতীয় খাদ্য যেমন: ভাত, আটা, আলু ও শাকসবজিতে জিংকের পরিমাণ খুবই কম। প্রাণিজ খাবার মাছ ও মাংসের মূল্য অনেক বেশি। গ্রাম ও শহরের অধিকাংশ দরিদ্র পরিবার প্রতিদিন এসব খাদ্য যথেষ্ট পরিমাণে খেতে পায় না। তাই ঐ সমস্ড় পরিবারের মধ্যেই জিংক অপুষ্টির হার অনেক বেশি।

আশার কথা এই যে, হারভেস্টপণ্ডাস (www.harvestplus.org) বিশ্বব্যাপী এই সমস্যাটির সুলভ এবং সহজ সমাধানের জন্য এগিয়ে এসেছে। হারভেস্টপণ্ডাস আন্ড়র্জাতিক কৃষি গবেষণা গ্র"প (সিজিআইএআর)-এর অন্ড়র্ভুক্ত একটি আন্ড়র্জাতিক গবেষণা প্রকল্প। এই প্রকল্প ২০০৩ সালে কার্যক্রম শুর" করে এবং ওয়াশিংটন ডিসিতে অবস্থিত আন্ড়র্জাতিক খাদ্যনীতি গবেষণা প্রতিষ্ঠান (ইফরি) ও কলম্বিয়ায় অবস্থিত আন্ড়র্জাতিক উষ্ণ অঞ্চলীয় কৃষি গবেষণা কেন্দ্র (সিয়াট)-এর যৌথ তত্ত্বাবধানে পরিচালিত। বিশ্বের চলিণ্ডশটি দেশের ৬০টি প্রতিষ্ঠানের দুশোরও বেশি বিজ্ঞানী এই প্রকল্পের সঙ্গে জড়িত। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রজননের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রধান খাদ্যে অনুপুষ্টির (Iron, Zinc, Vitamin A) অপুষ্টি থেকে মুক্ত করা।

বর্তমানে বিশ্বের নয়টি দেশের সাতটি খাদ্যশস্যে এই অনুপুষ্টি সমৃদ্ধকরণ কাজ চলছে। দেশ, ফসল ও অনুপুষ্টিগুলো হল : উগান্ডা ও মোজাম্বিকে মিষ্টিআলুতে ভিটামিন এ; র"য়ান্ডা ও কঙ্গো ডেমোক্রেটিক রিপাবলিকে ডাল জাতীয় খাদ্য ও শীমে লোহা; জাম্বিয়ায় ভুট্টায় ভিটামিন এ; ভারতে বজরায় লোহা ও জিংক; কঙ্গো ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক ও নাইজেরিয়ায় কাসাভাতে ভিটামিন এ; ভারত ও বাংলাদেশের ধানে জিংক এবং ভারত ও পাকিস্ড়ানের গমে জিংক। এই খাদ্য শস্যগুলো ঐসব দেশের প্রধান খাদ্য (Staple food)। তুলনামূলকভাবে এই খাদ্যগুলোর দাম কম এবং ধনী-দরিদ্র সবাই এই খাদ্য গ্রহণ করে থাকে। ফলে সকলেই এর সুবিধা ভোগ করতে পারবে। আমরা জানি, দরিদ্র জনগোষ্ঠী অবস্থাপন্ন শ্রেণির তুলনায় প্রধান খাদ্য (Staple food) পরিমাণে বেশি খায়। কারণ তা মাছ, মাংস ও শাকসবজির তুলনায় দামে সস্ড়া এবং ক্ষুধা নিবারণের জন্য তা অপরিহার্য। স্বভাবতই এই উদ্ভাবনটি দরিদ্রবান্ধব, ব্যয়সাশ্রয়ী ও টেকসই।

ইতোমধ্যে বাংলাদেশে এই কাজে যথেষ্ট অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। আমাদের দেশের প্রজননবিদগণ জিংক সমৃদ্ধ উন্নত ফলনশীল একটি ধানের জাত আবিষ্কারের প্রায় কাছাকাছি পৌঁছে গেছেন। এই উদ্ভাবনটি করা হয়েছে গতানুগতিক প্রক্রিয়ায় জিংক সমৃদ্ধ জাতের সঙ্গে উচ্চ ফলনশীল জাতের সংমিশ্রণের (Cross) মাধ্যমে। এটি কোনো GMO প্রযুক্তি নয়, যার বিরোধিতা আমাদের সুশীল সমাজের একাংশ করে থাকেন। জিংক অপুষ্টি দূরীকরণে এই ধানের কার্যকারিতা সম্বন্ধেও নানাবিধ গবেষণা চলছে এবং ইতোমধ্যেই অনেক আশাব্যঞ্জক ফল পাওয়া গেছে। আশা করা যায় যে, ২০১৪ সাল নাগাদ এমন একটি ধানের বীজ চাষাবাদের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া সম্ভব হবে।

আন বীজের প্রজনন ও তার কার্যকারিতার কাজ একসময় শেষ হবে। তারপরই শুর" হবে অন্য আরেক প্রচেষ্টা, যা হল এই ধানের চাষাবাদের ব্যাপক প্রসার করা এবং এর উপকারিতা সম্পর্কে নি আয়ের ভোক্তাদের অবহিত করা যাতে তারা বাজার থেকে এই ধানের চাল ক্রয়ে আগ্রহী হন। এজন্য প্রয়োজন হবে কৃষক, বীজ উৎপাদনকারী, মাড়াই কল সংস্থা, কৃষি বিপণনকারী, কৃষি সম্প্রসারণ কর্মী,

প্রচার মাধ্যম, ভোক্তা ও সুশীল সমাজের এক সমন্বিত প্রচেষ্টা। এই প্রচেষ্টার সাফল্যের উপরই নির্ভর করবে এই ব্যতিক্রমধর্মী গবেষণার ফলাফল জিংক অপুষ্টিতে আক্রান্ড় ভোক্তার কাছে পৌঁছানো। আনন্দের কথা এই যে, সম্প্রতি হারভেস্টপণ্ডাস ব্র্যাক (BRAC) এর সঙ্গে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে এবং ব্র্যাক সে লক্ষ্যেই কাজ করে যাচ্ছে। আশা করা যায় এই উদ্ভাবনের ফলে জিংকের অভাবজনিত অপুষ্টি নিবারণে আর প্রতিনিয়ত জিংক ট্যাবলেট খাওয়ার প্রয়োজন হবে না এবং এই খাদ্য উপাদানটির অভাবজনিত অপুষ্টির কারণে নানা শারিরীক সমস্যারও উদ্ভব হবে না। অতি অল্প খরচেই ভাতের মাধ্যমে জিংকের অভাবে অপুষ্টিজনিত সমস্যার সমাধান আমরা করতে সক্ষম হব।